মূলপাতা

পুঁজিবাদের পতনের যুগ

Asif Adnan

December 27, 2018

14 MIN READ

আজ আমরা অতিক্রম করছি পুঁজিবাদী জীবনব্যবস্থার অন্তিম পর্যায়। আমরা বেঁচে আছি সিস্টেমিক ট্র্যানযিশানের এক যুগে। একটি জীবনব্যবস্থা বা সভ্যতার সমাপ্তির সময়টাতে ভবিষ্যৎ ঝাপসা এবং অস্পষ্ট মনে হতে পারে। তবে এই ধোঁয়াশার মাঝেও একটা সত্য স্পষ্টভাবে দাবি করা যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর খুব বেশিদিন বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে পারবে না। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার ফলাফল থেকে মনে হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তার অন্তিম পর্যায়ে পৌছে গেছে।

আপনি যদি পুঁজিবাদের অন্তরাত্মার দিকে তাকান তাহলে দেখবেন মূলত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হল এমন এক ধরনের ব্যাক্তিত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্মিলন যেখানে রাজত্ব করে সম্পদের খাতিরে সম্পদ আর অর্জনের খাতিরে অর্জনের চিন্তা (accumulation for the sake of accumulation)। এই নীতির ভিত্তিতে নিজের কাজকে বৈধতা দেয়া এবং পৃথিবীর বুকে মানুষের চিরঅধরা রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা ব্যাক্তিই হল একজন পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদী হবার জন্য ধনী হওয়া আবশ্যিক না। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত ধনী ছিলেন কিন্তু পুঁজিবাদী ছিলেন না। তাহরীকে খিলাফতের (১৯১৯-২৩) ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান শেঠ ওয়ালি ভাই চোথানিও অনেক ধনী ছিলেন, কিন্তু পুঁজিবাদী ছিলেন না।

পুঁজিবাদের সবচেয়ে আদি ও প্রাথমিক রূপ হল সম্পদের অনৈতিক ব্যবহার। সম্পদের অসীম ও ক্রমাগত বৃদ্ধিই যখন সম্পদের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন সম্পদ পরিণত হয় পুঁজিতে (capital)। এই অর্থে পুঁজিবাদ হল হিংসা ও অর্থলিপ্সার বাস্তব, মূর্ত রূপ। আর পুঁজিবাদী হল সেই লোভ ও হিংসার গোলাম – দিনার দিরহামের পূজারী। একজন পুঁজিবাদী বিশ্বাস করে যে সম্পদের একমাত্র সঠিক ব্যবহার হল ক্রমাগত এর বৃদ্ধি।

তাই পুঁজিবাদী এ মানসিকতাকে ধারন করা ও মেনে নেয়া প্রতিটি শ্রমিক, কৃষক ও ভিখারি, তাদের দারিদ্র সত্ত্বেও নিজেরা এক একজন পুঁজিবাদী। পুঁজিবাদী মনস্তত্ত্বকে সবচেয়ে শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে উপযোগবাদী মূলনীতিগুলোকে (utilitarian principles) মেনে নেয়া সমাজে। কেননা পুঁজি ছাড়া কামনাবাসনার পেছনে অন্ধভাবে ছুটে চলা সম্ভব না। পুঁজিবাদী সমাজ তাই এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে ব্যাক্তিগত ও সামস্টিক প্রতিটি কাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল পুঁজি পুঞ্জীভূত করা (accumulation of capital)।

পুঁজিবাদী সমাজ বাজারের (Market) অন্তর্ভুক্ত ও অধীনস্ত হয়। সামাজিক জীবনের প্রতিটি দিককে বাজারই নিয়ন্ত্রণ করে। পরিবারগুলো থেকে সন্তানদের এমনভাবে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে তোলা হয় যাতে তারা সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ বানাতে পারে। সম্ভাব্য পাত্রপাত্রীর পরিবারের আর্থিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বিয়ের প্রস্তাবগুলো বিচার করা হয়। শেষপর্যন্ত সব কাজের মূল্যায়ন করা হয় টাকা আর পূজির বাজারেই।

পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা (যাকে একসময় 'সুশীল সমাজ' বলা হতো) প্রতিনিধিত্ব করে ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর গড়ে ওঠা সমাজের সম্পূর্ণ প্রত্যাখানের। কারণ সুশীল সমাজে কাজের মূল্যায়ন ইসলামের কোন বক্তব্য কিংবা বিধানের আলোকে হয় না। প্রতিটি কাজের মূল্যায়ন নির্ভর করে সম্পদ পুঞ্জিভুত করার ব্যাপারে তার কার্যকারিতার ওপর। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সবকিছুর হিসেব হয় দামের (price) ভিত্তিতে, যা বাজারই নির্ধারন করে দেয়।

সুশীল সমাজের সমৃদ্ধি হয় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের (Liberal Democracy) মতো পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায়। কারণ এই ব্যবস্থা 'স্বাধীনতা'র মূল্যবোধের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ। আর এই স্বাধীনতার অর্থ হল আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে 'স্বাধীনতা'। মর্ডানিস্ট এপিস্টেমোলজির (আধুনিক জ্ঞানতত্ত্ব) ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্বাধীনতা[1], সাম্য[2] আর সম্প্রীতির[3] লিবারেল বা উদারনৈতিক আদর্শগুলো এমন দুটি মৌলিক নীতিকে অস্বীকার করে যা মুসলিম হিসেবে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য:

1) মানুষের প্রথম পরিচয় হল সে আল্লাহ্‌র বান্দা, আল্লাহ্‌র গোলাম। কিন্তু মর্ডানিযম মানুষকে দেখে স্বনির্ভর, স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে যার কোন স্রষ্টা কিংবা রব্বের প্রয়োজন নেই।

2) মানবজীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র প্রতি শর্তহীন ও সম্পূর্ন আত্মসমর্পন। কিন্তু মর্ডানিযমের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মানবজীবনের উদ্দেশ্য হল বিশ্বের ওপর মানুষের কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। যেখানে আমরা বিশ্বাস করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-তে, সেখানে মর্ডানিস্ট এপিস্টোমোলজি মানুষকে দেবতার পর্যায়ে উন্নীত করে।

যেহেতু ব্যবস্থা হিসেবে পুঁজিবাদ মর্ডানিযমের এই আদর্শগুলোর বাস্তবায়ন চায়, তাই এটা বলা ভুল হবে না যে পুঁজিবাদের কালেমা হল লা ইলাহা ইলাল ইনসান (‘মানুষ’ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)। তাই পুঁজিবাদ হল আল্লাহ্‌, নবীগণ ও ইব্রাহীমী ধারার ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

যদিও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্থানের শুরু পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর দিকে, কিন্তু বিশ্বব্যাপী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত হয় পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ ও রাষ্ট্রীয়-সন্ত্রাসের মাধ্যমে। বিশেষ করে অ্যামেরিকার আদিবাসীদের ওপর চালানো নিয়মতান্ত্রিক জাতিগত নিধনের মধ্যে দিয়ে। তবে ব্যক্তি কিংবা সামাজিক পর্যায়ে বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ পুঁজিবাদ কখনোই নিতে পারেনি। পুঁজিবাদের পতনের শুরু হয় বিংশ শতাব্দীতে আর বর্তমানে পুঁজিবাদ মুখোমুখি নানা সংকটের। আত্মদর্শনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ সবচেয়ে গুরুতর যে সংকটের মুখোমুখি তা হল crisis of rationalism. পুঁজিবাদের সোনালী যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা র‍্যাশনালিযম আর মর্ডানিযমের দর্শন আজ মিথ্যা ও অসাড় প্রমাণিত হয়েছে। পুঁজিবাদের এই মিথগুলোকে যে আদর্শিক আন্দোলন ভেঙ্গে দেয় তা হল পোস্ট মর্ডানিযম। পোস্ট মর্ডানিযমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা ও চিন্তাবিদদের মধ্যে মিশেল ফুকো[1], দেরিদা[2], লিওটার্ড[3] ও রর্টি[4] বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পোস্ট-মর্ডান চিন্তাবিদরা যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেছেন যে স্বাধীনতা আর প্রগতির মতো পুঁজিবাদী বুলিগুলো শুধু অর্থহীনই না বরং এগুলো অর্জনও অসম্ভব। বাস্তবতা হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় খন্ডিত হয়ে পড়ে ব্যক্তির স্বত্বা (the self becomes fragmented), এবং অর্থের খোজ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। এ ব্যবস্থায় ব্যাক্তিগত কিংবা সামস্টিক, কোন কাজকেই বিশ্বাসের ভিত্তিতে অর্থবোধকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। পুঁজিবাদী ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র্য তাই অবধারিতভাবেই হয়ে পড়ে খন্ডিত ও বিভক্ত।

পুঁজিবাদের দ্বিতীয় বড় সংকট হল প্রাতিষ্ঠানিক। যে প্রতিষ্ঠানগুলো এতোকাল ধরে পুঁজিবাদকে টিকিয়ে রেখেছে সেগুলো আজ গুরুতরভাবে পতন ও ক্ষয়ের সম্মুখীন। পুঁজিবাদী বাজারগুলো চলে গেছে একচেটিয়া (monopoly) ব্যবসার নিয়ন্ত্রনে। ফলে ধ্বংস হয়ে গেছে বাজারের প্রতিযোগিতা। মার্কেট এখন আর দক্ষ, কার্যকরী আর ন্যায্য ফল দিতে পারছে না। দাম নির্ধারনের কোন বস্তুনিষ্ঠ মানদন্ড এখন আর নেই। ভারসাম্যহীনতাই (disequilibrium) পরিণত হয়েছে পণ্য ও অর্থ বাজারের স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে।

পুঁজিবাদের এই প্রাতিষ্ঠানিক সংকটের অন্যতম প্রধান কারণ হল শ্রেনী পরিচয়ের ভিত্তিতে আগে যেসব আন্দোলন গড়ে উঠতো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সেগুলোকে নিজের মধ্যে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। পুঁজিবাদের সোনালি যুগে তৈরি হওয়া সবচেয়ে দৃশ্যমান সামস্টিকতা ছিল ‘শ্রেণী’, একথা আমরা সবাই জানি। শ্রেণী পরিচয়কেন্দ্রীক শ্রমিক সংগঠনগুলো (ট্রেড ইউনিয়ন এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি) পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরেই কাজ করতো, এবং পুঁজিবাদ ন্যায়বিচারের যে নিজস্ব ধারণা তৈরি করে তার জন্য সংগ্রাম করতো। এই সংগঠন ও আন্দোলনগুলো পুঁজিবাদের সংশোধনের (selfcorrecting mechanism) কাজ করতো। পুঁজিবাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এধরনের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক আন্দোলনের গুরুত্ব কেইন্সের[5] আলোচনা থেকে বোঝা যায়।

কিন্তু পুজিবাদী রাষ্ট্র আজ এমনভাবে শ্রমিক আন্দোলনগুলোকে নিজের মধ্যে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে যে ‘ন্যায়বিচার’ এর জন্য সংগ্রাম করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব না। আর এটা এমন এক সময়ে ঘটেছে যখন অ্যামেরিকা ও ইউরোপের জনগণের বড়

একটি অংশ (ছাত্র, বেকার, অবসরপ্রাপ্ত) শুধু রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্নই হয়ে পড়েনি বরং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের অংশগ্রহনও নেই বললেই চলে।

আজ পশ্চিমে শ্রমিক আন্দোলনের জায়গা দখল করে নিয়েছে নতুন বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন। যেমন নারীবাদ, সমকামী অধিকার আর পরিবেশবাদী আন্দোলন। স্পটতই নব্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে নতুন করে সাজানোর ব্যাপারে এসব আন্দোলন কোন ধরনের ভূমিকা রাখতে সক্ষম না।

পুঁজিবাদের পতনের গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি চিহ্ন হল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভাঙ্গন। মিডিয়ার ওপর পুঁজিবাদীর প্রভাবের কারণে 'জনমত' তৈরিতে জনগণের এখন আর কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। মিডিয়াই এখন 'জনমত' তৈরি করে দেয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এখন একধরনের বিনোদনে পরিণত হয়েছে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব প্রায় পুরোপুরিভাবেই আজ পুঁজির দখলে। ইউরোপের নির্বাচনগুলোতে জনগণের অংশগ্রহণ ধারাবাহিকভাবে কমছে। ১৯৪৬ এর পর কোন অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত হয়নি। নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগেই যখন মিডিয়া নির্বাচনের প্রত্যাশিত ফলাফল জানিয়ে দেয় তখন কেউ কেন ভোট দিতে যাবে? একারনেই কোন রাজনৈতিক দার্শনিক আজ ইউরোপে খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি উৎসাহের সাথে গণতন্ত্রের পক্ষে ওকালতি করেন।

মর্ডানিস্ট-পুঁজিবাদী এপিস্টেমোলজির মহারথীদের অন্যতম হেইবারমাস[6] দুঃখ করে বলেছেন, মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ এতোটাই বিকৃত হয়েছে যে সংলাপভিত্তিক গণতন্ত্র কোন অস্তিত্বই আজ আর নেই। একইভাবে Alian Badiou[7] বলেছেন, গণতন্ত্র হল ঐ শেকল যা জনগণকে পুঁজিবাদের আস্তাবলে বেঁধে রাখতো।

চতুর্থত নেতৃস্থানীয় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো একের পর এক সামরিক পরাজয়ের মুখোমুখি হচ্ছে। অপমানজনক এক পরাজয়ের পর অ্যামেরিকা বাধ্য হয়েছে ইরাক থেকে পালাতে । আফগানিস্তানে তারা আরো বেশি অপমানজনক এক পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে। অন্যদিকে বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনিযুয়েলা এবং কিউবা সফলতার সাথে অ্যামেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে ল্যাটিন অ্যামেরিকায় রুখে দিয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারাবাহিক পতন নিয়ে সন্দেহ না থাকলেও বিকল্পের রূপরেখা স্পষ্ট না। আমাদের সময়ের সাথে এদিক দিয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ খ্রিস্টিয় শতাব্দীর মিল আছে। এ সময়টাতে রৌমান ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্র অবক্ষয় ও ধ্বংসের এক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। অন্তিম পর্যায়ে পৌছে যাওয়া রৌমান শাসন ব্যবস্থা একের পর এক সংকটের মুখোমুখি হচ্ছিল, কিন্তু কোন স্পষ্ট বিকল্প দেখা যাচ্ছিল না।

একইভাবে আমাদের সময়ের নতুন রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব বর্তমান যুগকে রুপান্তর ও পরিবর্তনের এক পর্যায় হিসেবে দেখে। রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর অল্প কিছু পুজিবাদীর নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে আসছে, একথা বডরিয়ার্ডও[8] স্বীকার করেছেন। তার জায়গা দখল করে নিচ্ছে ব্যাক্তিস্বাতন্ত্র, সমাজ ও রাষ্ট্রের ব্যাপারে অ-পুজিবাদী বিভিন্ন ধারণা। ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে পুঁজিবাদী র‍্যাশনালিটির বলয়। পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের ধ্বংসস্তূপের ওপর আমরা হয়তো সমাজ ও রাষ্ট্রের অ-পুজিবাদী বিভিন্ন মডেলের উত্থান দেখতে পাবো। এই কন্টেক্সটে, ডিলিউয (Deluze) এর দাবি হল, পুঁজিবাদ ভেঙ্গে পড়ছে নিজের ভেতর থেকেই। ব্যাপারটা কি আসলে তাই নাকি এটা বিদ্যমান সমস্যাগুলো সময়ের সাথে সাথে আরো জটিল হবার ফল, সেটা সময়ই বলে দেবে।

ইসলামী সংস্কার

সাম্রাজ্যবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলো অস্ত্রের জোরে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে মুসলিম বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। সাধারণভাবে এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল সামরিক প্রতিরোধের। উপমহাদেশে এই সামরিক প্রচেষ্টা স্থিমিত হয়ে আসার পর ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জমিয়ত উলামা-এ-হিন্দ। তখন থেকেই উপমহাদেশের অধিকাংশ আলিম পুঁজিবাদী

ব্যবস্থার প্রতি অনেকটাই আপসকামী অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এই অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ দুই ভাবে হয়েছে। একদিকে আলিমদের একটি অংশ রাজনৈতিক পরিমন্ডল থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিলেন। অন্যদিকে আলিমদের আরেকটি অংশ সক্রিয়ভাবে পুঁজিবাদী রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতর অংশগ্রহনের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে ইসলামের জন্য একটি জায়গা করে নেয়ার চেষ্টা শুরু করলেন।

আলিমদের অধিকাংশ প্রথম পন্থা অবলম্বন করলেন। তারা মনযোগ দিলেন সমাজে ইসলামী ব্যাক্তিত্ব ও ইসলামী শিক্ষার প্রচলনের দিকে। বৈরী এই পরিবেশে তারা ইসলামের সমৃদ্ধ ইলমী ঐতিহ্য সংরক্ষনেরও চেষ্টা করলেন। এক্ষেত্রে তাঁদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল পুরো উপমহাদেশ জুড়ে মাদ্রাসার এক নেটওয়ার্কগড়ে তোলা। এই ক্ষেত্রে উলামায়ে দেওবন্দের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় পন্থা (অর্থাৎ সিস্টেমের ভেতর অংশগ্রহণ করা) এর প্রতিনিধিত্ব করছিল খিলাফত আন্দোলন ও জমিয়ত উলামা-এ-হিন্দের সাংবিধানিক আন্দোলন। এই স্ট্র্যাটিজির উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদী কাঠামোর ভেতরেই ইসলামী ব্যাক্তিত্ব, মূল্যবোধ, এবং সমাজের জন্য জায়গা তৈরি করা। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামী রিভিশনিযম বলা যেতে পারে। ইসলামিক রিভিশনিযম পুঁজিবাদকে একটি অখন্ড সম্পূর্ণতা বা আলাদা জীবনব্যবস্থা হিসেবে দেখে না। বরং এটি পুঁজিবাদী বিভিন্ন কার্যক্রমকে বিচ্ছিন্নভাবে নুসুসের আলোকে দেখে এবং পুঁজিবাদী কার্যক্রমগুলোকে এমনভাবে সংস্কার ও পরিবর্তনের চেষ্টা করে যাতে করে সেগুলোকে শরীয়াহর অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়।

এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে ইসলামিক রিভিশনিযম ও ইসলামিক মর্ডানিযমের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। ইসলামিক মর্ডানিস্ট শরীয়াহর শিক্ষাকে পুঁজিবাদী দর্শনের মানদন্ডে বিচার করে এবং শরীয়াহর শিক্ষাগুলোকে এমনভাবে বদলে নেয় যাতে করে ইসলামকে মর্ডানিস্ট-পুজিবাদী কাঠামোর মধ্যে খাপ খাওয়ানো যায় (Reconstruction of religious thought in Islam)। ইসলামি রিভিশনিযমকে এর উল্টোটা বলা যায়। ইসলামী রিভিশনিস্ট শরীয়াহর শিক্ষার আলোকে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমগুলোকে শরীয়াহসম্মত বানানো চেষ্টা করে। ইসলামী রিভিশনিযম হল পুজিবাদের ইসলামীকরন।

তবে পার্থক্য সত্ত্বেও ইসলামী মর্ডানিস্ট ও রিভিশনিস্টের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি মিল আছে। দুজনের কেউই পুঁজিবাদের সাথে সংঘাতকে আবশ্যিক মনে করে না। পুঁজিবাদের সাথে আপসকে তারা শুধু সম্ভবই মনে করেন না, বরং সম্ভবত অবশ্যম্ভাবীও মনে করেন। আপসকামী এ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক শাসনের ইসলামীকরনের চেষ্টা শুরু করে। ১৯৭০ এর পর থেকে সৌদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয় পুঁজিবাদী অর্থনীতির ইসলামীকরনের চেষ্টা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তুলনামূলকভাবে কম সময়ের মধ্যে সারা বিশ্ব জুড়ে গড়ে ওঠে ইসলামী ব্যাংকসহ বিভিন্ন ইসলামী পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান।

কার্যত ইসলামী মর্ডানিযম এবং ইসলামী রিভিশনযিমের মাধ্যমে ইসলামী ব্যবস্থা তো দূরের কথা, ইসলামী সমাজের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব না। বরং এসব আন্দোলনের ফসল হল ইসলামী ব্যাংক্তিত্ব ও সমাজ পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার অধীনস্ত হওয়া। মুহাম্মাদ যাহিদ সিদ্দিকী মুঘল এ বইতে ইলমী গবেষণার মাধ্যমে এ বাস্তবতাকেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। ইসলামী ব্যাংকিং আর ইসলামী গণতন্ত্রের প্রচার, প্রসার ও অনুসরণের মাধ্যমে, খাইরুল ক্বুরুন, সোনালি প্রজন্মের অবস্থার কাছাকাছি পৌছানোও অসম্ভব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় থেকে শুরু করে উসমানী সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ পর্যন্ত উম্মাহর মধ্যে ইসলামী ব্যাংকিং কিংবা ইসলামী আইনসভার কোন ধারণা ছিল না। বাস্তবতা হল ইসলামী রিভিশনিযম উনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে উম্মাহর পরাজয়কে এক স্থায়ী, অপরিবর্তনযোগ্য বাস্তবতা মনে করে। এই ধরনের অবস্থান গ্রহন করার পর যৌক্তিক উপসংহার এটাই আসে যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতনের জন্য চেষ্টা করা হল ‘শক্তি ও সময়ের অপচয়’, তার চেয়ে বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমেই আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে।

কিন্তু পুঁজিবাদের প্রতি এধরনের অবস্থান গ্রহনের ফলে উম্মাহর ও উম্মাহর আত্মপরিচয়ের যে কতো বড় ক্ষতি হচ্ছে সেটা তারা অনুধাবন করেন না। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হল মুসলিম সমাজের চিন্তাবিদ ও নেতারা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবনতি ও পতন (systemic decline) সম্পর্কেআজো বেখবর। তারা আজো পড়ে আছে উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছিল তার ক্ষমতা ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ পর্যায়ে, এবং এর বিরোধিতা অত্যন্ত কঠিন, এমনকি অসম্ভবও মনে করা হতো। তবে এমন প্রতিকূল সময়েও মুজাহিদিন জিহাদকে ছেড়ে দেননি।

আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন ভেঙ্গে পড়ছে, যখন পশ্চিমা জোট ইরাক ও আফগানিস্তানে মুজাহিদিনের কাছে পরাজিত হয়েছে তখনও পুঁজিবাদের প্রতি আপসকামী অবস্থান নেয়া নিঃসন্দেহে অবিবেচকতা ও অবিমৃষ্যকারীতার লক্ষণ। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতন সশস্ত্র বিল্পব ছাড়া হয়নি। শুধু দাওয়াহ, ইলমী গবেষণা অথবা আত্মশুদ্ধির কিছু প্রচেষ্টা দিয়ে এই কাজ অসম্ভব। ভাইকিংস, ভিসিগথস, ভ্যান্ডালসসহ বিভিন্ন জার্মানিক গোত্রের হাতে রোমান সাম্রাজ্যের একের পর এক পরাজয় না ঘটলে এবং নতুন ব্যবস্থা গড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় শুন্যতে তৈরি না হলে খ্রিষ্টীয় জীবনব্যবস্থা কখনোই ইউরোপের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতো না। ওসওয়াল্ড স্পেংলার[9] তার লেখায় এ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রোমান শাসনের পতনের পরও খ্রিস্টবাদকে গ্রহণ করে নিতে ইউরোপের অধিকাংশ মানুষের আরো দেড়শো বছর সময় লেগেছিল। তাই আমাদের এ সত্যটা বুঝতে হবে যে আমরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিকভাবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরাজিত করতে না পারি, এবং বিভিন্ন অঞ্চল দখল করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্ব থেকে এ ব্যবস্থাকে সরাতে না পারি, তাহলে আমরা কখনোই ইসলামীকরনের চেয়ে এক পাও সামনে আগাতে পারবো না। আমরা যতোই ইসলামীকরন বা এমন অন্যকোন আংশিক–সমাধান নিয়ে ব্যস্ত হবো ততোই আমাদের সব অ্যাকাডেমিক, আধ্যাত্বিক এবং দাওয়াতী কাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অধীনস্ত হতে থাকবে, এবং ইসলামী আধিপত্য এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার চিন্তাও একসময় অবাস্তব মনে হবে।

কোন জীবনব্যবস্থা শুধু ইলমী, দাওয়াতী ও আধ্যাত্মিক চেষ্টার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কোন নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা তৈরি করতে হয় সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। মক্কা বিজয়ের পরই মানুষ দলে দলে ইসলামে ঢুকেছে, এটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর পদ্ধতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় থেকে শুরু করে খলিফা দ্বিতীয় আব্দুল হামিদ পর্যন্ত প্রতিটি ইসলামী রাষ্ট্র নিয়মতান্ত্রিকভাবে জিহাদ চালিয়ে গেছে, আর এ সামরিক বিজয়গুলোর কারণেই ফিকহ, কালাম, উসুল ও তাযকিয়্যাহ চর্চা এবং এ শাখাগুলোকে গোছানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজ তার অন্তিম পর্যায়ে পৌছে গেছে। এরই মধ্যে এ ব্যবস্থার ভাঙ্গন শুরু হয়ে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের চিন্তা করা দরকার: উম্মাহর কি আজ পুঁজিবাদী দর্শন ও প্রতিষ্ঠানের ইসলামীকরনই দরকার? আজ সময় এসেছে সামরিক সাফল্যের মাধ্যমে তৈরি হওয়া এ ঐতিহাসিক মূহুর্তকে কাজে লাগিয়ে ইসলাম এর সংরক্ষন ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী নতুন কৌশল গ্রহণ করার।

> ইসলামী ব্যাংক - ভুল প্রশ্নের ভুল উত্তর [প্রকাশিতব্য]বইয়ের ভূমিকা হিসেবে লেখা ড.জাভেদ আকবর আনসারির প্রবন্ধের অনুবাদ।

* * *

[1] মানুষ স্বনির্ভর, স্বাধীন এবং সম্পূর্ণভাবে স্বায়ত্ত্বশাসিত। শর্তহীনভাবে যখন ইচ্ছে, নিজের যেকোন চাহিদা ও কামনাবাসনা মেটানোর অধিকার তার আছে।

[2] প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে এই শয়তানী আত্ম-উপাসনায় নিমগ্ন হবার।

[3] সবার উচিৎ অপরের স্বাধীনতা বাস্তবায়নের এই অধিকারকে শ্রদ্ধা করা

[1] মিশেল ফুঁকো, মৃত্যু ১৯৮৪। ফ্রেঞ্চ দার্শনিক, সোশ্যাল থিওরিস্ট, ঐতিহাসিক এবং লিটারাই ক্রিটিক

[2] যাক দেরিদা, মৃত্যু ২০০৪। ফ্রেঞ্চ দার্শনিক যিনি ডিকনস্ট্রাকশান তত্ত্বের জন্য সুপরিচিত

[3] যন ফ্রাসোয়া লিওটার্ড, মৃত্যু ১৯৯৮। ফ্রেঞ্চ লিটারারি থিওরিস্ট

[4] রিচার্ডম্যাকেই রর্টি, মৃত্যু ২০০৭। অ্যামেরিকান দার্শনিক।

[5] জন মেইনার্ডকেইন্স - অ্যামেরিকান অর্থনীতিবিদ। কেইন্সিয়ান অর্থনীতির জনক।

[6] ইয়্যুরগেন হ্যাবেরমাস, জার্মান দার্শনিক ও সোশিওলজিস্ট।

[7] ফ্রেঞ্চ দার্শনিক

[8] যন বডরিয়ার্ড, মৃত্যু ২০০৭। ফ্রেঞ্চ দার্শনিক এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক, পোস্ট মর্ডানিযমের ওপর কাজের জন্য বিখ্যাত।

[9] ওসওয়াল্ড আর্নল্ড গটফ্রিড স্পেংলার, জার্মান ঐতিহাসিক ও দার্শনিক।